Vol. 58 | No. 1-2 | 2023

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বংশীদাসের রাইরাজা পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার: ক্ষমতা-তত্ত্বের প্রতিফলন

Volume	58
Issue	1-2
Year	2023
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Md Najmul Hossain
Published online	February 1, 2023
DOI	10.62328/sp.v58i1-2.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v58i1-2.8
Pages	১৫৭-১৭৯
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বংশীদাসের রাইরাজা পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার: ক্ষমতা-তত্ত্বের প্রতিফলন

Check for updates

মো. নাজমুল হোসেন

সাহিত্য পত্রিকা
Shahitto Potrika

eISSN 3006-886X
ISSN 0558-1583
Volume 58
Number 1-2
February 2023

সাহিত্য পত্রিকা: ফাল্গুন ১৪২৯ (২০২৩)
বর্ষ: ৫৮ সংখ্যা: ১-২ পৃষ্ঠা: ১৫৭-১৭৯

DOI 10.62328/sp.v58i1-2.8

সাহিত্য পত্রিকা
বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বংশীদাসের *রাইরাজা* পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার: ক্ষমতা-তত্ত্বের প্রতিফলন

মো. নাজমুল হোসেন*

সারসংক্ষেপ: পাণ্ডুলিপিতে একটি জাতির ঐতিহ্য ও মননের ইতিবৃত্ত ধরা থাকে, তাই পাণ্ডুলিপির পাঠ জরুরি। পঞ্চদশ শতাব্দীর পদকর্তা বংশীদাস রচিত রাইরাজা পাণ্ডুলিপি মধ্যযুগের ইতিহাসের অনালোকিত একটি প্রান্তের উদ্ভাসন। এ কাব্যে বৈষ্ণব প্রেমদর্শনের বিচিত্র একটি রূপ প্রকাশ পেয়েছে, যেখানে প্রণয়লীলা ছাড়াও রাধা-কৃষ্ণকে ক্ষমতা-সম্পর্কে প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে বংশীদাসের রাইরাজা পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি সভ্যতার ইতিহাসে মাতৃ-তন্ত্রের অবসান ঘটার মধ্য দিয়ে পিতৃতন্ত্র বা পুরুষতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং দৈবকল্পনায় আদ্যাশক্তির পরিবর্তে পুরুষ দেবতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সমান্তরালে নারীর অধস্তনতার ইতিহাস অনুসন্ধান করা হয়েছে। এছাড়াও স্বল্প সময়ের জন্য, রাধা ক্ষমতার কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত হলেও পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিকল্প ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হওয়ায় শেষ পর্যন্ত ক্ষমতা-সম্পর্ক কীভাবে প্রেমতত্ত্বে পর্যবসিত হয়, তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পাণ্ডুলিপি শাখায় এখনও বহুসংখ্যক পাণ্ডুলিপি পাঠোদ্ধার এবং সম্পাদনার অপেক্ষায়। গ্রন্থাগার থেকে বিভিন্ন সময় পাণ্ডুলিপির কিছু ক্যাটালগ প্রকাশিত হয়েছে, এর একটি হলো *পাণ্ডুলিপি পরিচিতি* (২০০৬)। এ ক্যাটালগেই *রাইরাজা* নামের একটি পাণ্ডুলিপির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। পাণ্ডুলিপিটি বৈষ্ণব সাহিত্যের ধারায় একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ সংযোজন। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকে উপজীব্য করেই বৈষ্ণব সাহিত্যের বিকাশ এবং এ প্রেমে মিলনের অপেক্ষা বিরহই প্রধান। মিলনের গভীর ব্যঞ্জনা সৃষ্টির জন্য পদকর্তাগণ প্রেমকে বিরহের প্রতিবন্ধকতায় জটিল করে তুলেছেন। এদিক থেকে বৈষ্ণব কবিদের হাতে রাধাচরিত্রের বিচিত্র পরিকল্পনা দেখা যায়। তবে রাধাকে বৃন্দাবনের রাজা হিসেবে বর্ণনা করার দুঃসাহসও মধ্যযুগের সমাজব্যবস্থায় কোনো কোনো কবি দেখানোর প্রয়াস পেয়েছেন। এদিক থেকে *রাইরাজা* কাব্য নিঃসন্দেহে অভিনব। তাই ক্ষমতা সম্পর্কের নিরিখে এ কাব্যের চমৎকার একটি পাঠ বিবেচিত হতে পারে। এ ভাবনা থেকেই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্যোগ; এক্ষেত্রে প্রবন্ধটি দুটি অংশে বিভক্ত, প্রথম অংশে পাণ্ডুলিপি, লিপিকর ও পদকর্তা পরিচিতির পাশাপাশি পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার এবং পাঠান্তর সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে ক্ষমতা-সম্পর্কের নিরিখে পাঠ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পাণ্ডুলিপি পরিচিতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পাণ্ডুলিপি শাখায় 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ: ৯৫০' সংখ্যক *রাইরাজা* নামাঙ্কিত একটি পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। বৈষ্ণবকাব্য বিষয়ক এ পাণ্ডুলিপির রচয়িতার নাম বংশীদাস। ৬ পত্রে সম্পূর্ণ এ পাণ্ডুলিপি ৩৭ x ১৩ সে.মি. তুলট কাগজের উপর লেখা হয়েছে। পাণ্ডুলিপিটি ১২২১ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে লিপিকর কর্তৃক অনুলিখিত হয়েছে। লিপিকরের নাম শ্রীরামমোহন মিত্র। পাণ্ডুলিপির পুষ্পিকায় উল্লেখ করা হয়েছে লিপিকরের গ্রামের নাম দেওভোগ। এ দেওভোগ শীতলক্ষ্যা তীরবর্তী বৈষ্ণব অধ্যুষিত নারায়ণগঞ্জ শহরের দেওভোগ গ্রাম বলেই প্রতীয়মান হয়।

পদকর্তা পরিচিতি

রূপ গোস্বামীর *দানকেলিকৌমুদী* নাটক থেকে বিষয় সংগ্রহ করে প্রসিদ্ধ পদকর্তা বংশীদাস *রাইরাজা* আখ্যান রচনা করেছেন। *পদকল্পতরু* গ্রন্থের সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় পদকর্তা হিসেবে জ্ঞানদাস, বলরাম দাস, রায়শেখর ও লোচন দাসের পরেই বংশীদাসের স্থান নির্দেশ করেছেন। তাঁর পরিচয় প্রসঙ্গে *বংশী-বিলাস* গ্রন্থে আছে -

নদীয়ার মাঝখানে সকল লোকেতে জানে
কুলিয়া পাহা নামে স্থান।
তথায় আনন্দ ধাম শ্রীছকড়ি চট্টোনাম
মহাতেজা কুলীন সন্তান।।

ভাগ্যবতী পত্নী তাঁর রমণী কুলেতে যাঁর
যশোরাশি সদা করে গান।
তাঁহার গর্ভেতে আসি কৃষ্ণের সরলা বাঁশী
শুভক্ষণে কৈলা অধিষ্ঠান।।
দশ মাস দশ দিনে রাকাচন্দ্র লগ্ন মীনে
চৈত্র মাসে সন্ধ্যার সময় ।
গৌরাঙ্গ চাঁদের ডাকে তুষিতে আপন মাকে
গর্ভ হৈতে হইলা অধিষ্ঠান।।
(সতীশ, ১৩৩৮: ১৮০)

আবার *বংশীশিক্ষা* গ্রন্থে আছে –

শ্রীছকড়ি চট্টোনাম বিখ্যাত ভুবন।
পাটুলীর বাস ছাড়ি তেঁহ কুলিয়ায়।
বাস করিলেন আসি আপন ইচ্ছায় ।।
তাঁহার আত্মজ বংশী জানে সর্ব্বজনে।

... ...
চৌদ্দ শত ষোল শকে মধু পুর্ণিমায় ।
বংশীর প্রকটোৎসব সর্ব্বলোকে গায়।।

(সতীশ, ১৩৩৮: ১৮০)

তাহলে বোঝা যাচ্ছে বংশীদাসের জন্মকাল ১৪১৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দ। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণের পর শচীদেবী এবং বিষ্ণুপ্রিয়ার রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। এ পদকর্তাই *রাইরাজা* কাব্যের রচয়িতা বংশীদাস। ইনি ছাড়াও বাংলা সাহিত্যে আরো একজন বংশীদাস স্বনামখ্যাত। তিনি পূর্ববঙ্গের বিখ্যাত মনসামঙ্গল কাব্য রচয়িতা দ্বিজ বংশীদাস। তবে তিনি মনসার ভাসান গানের জন্য বিখ্যাত। তাঁর রচিত কোনো বৈষ্ণব পদের উল্লেখ কোথাও দেখা যায় না।

পাঠোদ্ধার

শ্রী রাধাকৃষ্ণায়ে নম। অথ রাইরাজা।
বৃন্দাবন মাজেতে সকল সখীগণ।
তাহার মৈদ্ধে সোভা করে শ্রীনন্দের নন্দন॥
বিনোদিনি রাধিকা সুভিত শ্যামের বামে।
রূপ হেরি মুরছিত কত কুটী কামে॥
শ্যাম অঙ্গে পরসিতে রাধিকা বিভোল।
মুরচি পড়য় ধনি নাগরের কোল॥
রাধারে মুর্চ্ছিত দেখী সুনাগর হরি।
রাধার হিয়ার হার নাগরে কৈল চুরি।।
গজমতি হরি লৈল নন্দের নন্দন।
কহে বংশী রসবতি পাইলা চেতন॥
চৈতন্য পাইয়া রাই হিয়া পানে চায়।
কাচলি উপরে হার দেখীতে না পায়।।
রাধিকা ধরিয়া বোলে ললিতার হাতে।
নিধুবনে হার চুরি হইল আচম্বিতে।।
কেবা হরি নিল মোর গজমতি হার।
কেবা রাজা কারে কবো কে করে বিচার॥
পদ্মাবতি ডাকি বোলে রাজা জদি রাই।
নিধুবনে রাজা কর রসবতি রাই॥
তবে সে হইব হার চুরির বিচার।
মোরা সব অনুচর হইব রাজার।।
সব গোপীগণ হইব শহরেতে প্রজা।
শ্যামে বোলে কোতাল হবে রাই জদি রাজা।।

কোতাল হইয়া আমি শহরে থাকিব।
রাধিকা রাজার দোহাই সভার আগে দিবা।।
তবে জদি হএ হার চুরির বিচার।
রাজার হুঙ্কার দোস দণ্ড লইব তার॥
সবে বোলে ভাল ২ এহি সে উচিত।
বংশীদাসে বোলে শ্যাম নাগর উল্বাসিত।।
নিধুবন মাজেতে সকল সখী মিলি।
কুঞ্জে কুঞ্জে রহে তারা নানা ফুল তুলি॥
মাধবি লবঙ্গলতা আর গোরচনা।
কৌস্তরিক তুলিয়া আনিল নাগদোলা।।
করবি নাগেশ্বর তোলে আর আচলিকা।
মাধবি মালতি যুতি গন্ধমল্লিকা।।
নানা ফুল তুলিয়া আনিল গোপীগণ।
সবে মিলি করে তবে রাজ আভরণ॥
আনন্দিত হইয়া সবে বোলে জয়২।
আজি রাই রাজা হবে বংশীদাসে কএ।।

রাজ আভরণ লইয়া গোপীগণ
বোলে সুমধুর বানি।
আইস গ কিসোরি অবিসেক করি
সিঙ্গাসনে বৈস ধনি।।
জমুনার জল অতি সুসিতল
হেমঘট ভরি আছে।
কদলি সুন্দর বৃক্ষ মনহর
রপিআছে স্থানে২॥
বাজায় ভেউরি মৃদঙ্গ দোসরি
বাদ্য জে বাজে বাজনা।
জগডম্প সাজে পঞ্চসরি বাজে
বাদ্য বাজে সুরঙ্গনা॥
পঞ্চদক লইয়া নিরে মিশাইয়া
সুগন্ধি চন্দন তায়।
জয়২ ধনি করিয়া গোপিনী
ঢালিছে রাজার গায়।।
সব গোপ নারি রহে সারি২
রাধার বয়ান চায়্যা।
বংশীদাসে ভণে রাধার চরণে
শ্যাম পড়ে ভূমে লোটাইয়া।।
নিধু বনে পাটের রাজা হইলেক রাই।
রাই বোলে রাজা হইলে পাত্র মিত্র চাই।।

ললিতা সুন্দরি পাত্র মোর মনে আছে।
সামনে ধরিব ছত্র থাকিব মোর কাছে॥
মন্ত্রি হইব বৃন্দাদেবি বিসখা জেহ্বারি।
রঙ্গ দেবী তাম্বুল জোগাবে আগুসারি॥
সব গোপীগণ প্রজা হইব শহরে।
পান দিয়া নিসা করি রভসাকারে॥
শ্যামে বোলে কিছু সবে হইলেক প্রজা।
মোর না হইল নিসা সোন মহা রাজা॥
রাধা বোলে পাত্র আন নিসা করি দিব।
কোতাল করিয়া তোমা শহরে রাখীব।।
রাজার বচনে হরসিত শ্যাম রায়।
জে আজ্ঞা বলিয়া হাত দিলেন মাথায়।।

হেন কালে ললিতা আসিল রাজার কাছে।
জোরকরে সুনাগর দাড়াইয়াছে।।
ললিতা বোলেন বানি সোন মহারাজ।
শ্যামেরে কোতালি দিয়া রাখ কুঞ্জের মাজ।।
সুনিয়া পাত্রের কথা বলে ভালি২।
ধর পান শহরেতে করগে কোতোআলি॥
জে আজ্ঞা বলিয়া পান তুলি লৈল শিরে।
বংশী বোলে শ্যাম রায় চলিলা শহরে।।
কোতাল হইয়া স্যাম চলিলা শহরে।
রাধা জয়২ সঘনে ফুকারে॥
ঝনঝনি বাদ্য বাজনা বাজে আগে।
শ্যাম বোলে কিছু২ রাজকর লাগে॥
সবে বোলে বিকিকিনি কিছু নাহি হয়।
এত ঝাটে কিবা আছে পাত্র মহাসএ॥
শ্যামে বোলে রাজা হইল ব্রজভানু বালা।
আমারে কোতালি দিয়া দিল পান মালা॥
ইবোল বলিয়া শ্যাম ফিরে কুঞ্জবনে।
হেনকালে রসবতীর হার পড়ে মনে॥
রাই বোলে কোথা পাত্র ললিতা সুন্দরি।
খুজি দেও মোর হার কে করিল চুরি।।
ললিতা বোলেন পদ্দা কোতাল কুথা গেল।
মহারাজার হার চুরি খুজি দিতে হইল।।

এত সুনি পদ্দা জাএ স্যামের গোচরে।
বংশী বোলে শ্যাম রায় তন পহুজুরে।।
ইবোল সুনিয়া শ্যাম হরসিত হইয়া।
রাধার আগে উপস্থিত দুই কর যুড়িয়া।।

গলায় বসন দিয়া বোলে শ্যামমণি।
কি কারণে তাপ হইল কহো আমি সুনি।।
তর্জন গর্জন পাত্র মিত্রে বোলে বানি।
মহারাজার হার চুরি খুজি দেও আনি॥
সুনিয়া এসব বানি শ্যামধন কএ।
আমার আমলে হার চুরি নাহি হয়॥
ক্রোধযুক্তি তখনে হইল রসবতি।
কোতালের গলার হার আন শিগ্রগতি॥
ইবোল সুনিয়া শ্যাম হেট কৈল মাথা।
বংশী বোলে চান্দমুখে নাহি স্বরে কথা।।
সুনিয়া রাজার কথা রঙ্গ বিদ্যাধরি তথা
ধরিয়া রাখীলা গুণমণি।
দুই চক্ষু ফুটী উঠে মুখে বাক্য নাহি ছোটে
সুধাইলে নাহি কহে বানি।।
জখন নিকুঞ্জ মাজে ছিল আমি মহারাজে
তখন আমি আছিলাম ভাল।
কুঞ্জের রাজা হইলা তুমি কোতাল হইল আমি
তাহে মোর এহি দসা হইল।।
রসবতি তুমি দেখ নিরক্ষিয়া আমার মাথার চূড়া কে নিল আলাইয়া
মোর কেবা আলাইয়া নিল চূড়া।
শ্রবণে কুণ্ডল ছিল পদ্মাবতি কাড়ি নিল
কেহ কাড়ি নিল পীত ধড়া।।
এহি হেতু আপোনার দেসে না রহিল আর
হেন সাস্তি কেহ নাহি করে।
বংশী দাসে বোলে রাই শ্যাম চান্দের মুখ চাই
বাহু পসারিয়া দিলা কোলে॥
এতসব অনুরূপ দেখীয়া মাধুরি।
শ্যামের আগে দাড়া হৈল নবিন কিসোরি॥
কনকের লতা জেন বেড়িল তমালে।
চান্দ রাহু উদএ হইল এককালে॥
দোহ মুখ চাহিয়া ললিতা বোলে হাসি।
চান্দে দেখ উপরাগ গ্রাসিল আসি।।
বিসখা বলিল সোন প্রাণের ললিতা।

মনে এক উপজিল অদভূত কথা।।
হাসিয়া বিসখা দেবী রাধিকারে কএ।
গ্রহণের কালে কিছু দান দিতে হএ।।
ইবোল সুনিয়া রাই হরিস অন্তরে।
কহে বংশী রসবতি কহিছে তাহারে।।
হেদে গ ললিতা মোরে উপদেস দে।
কি দান করিব আমি দান নিবো কে॥
ললিতা বোলেন দান নিবে শ্যামধন।
তাহাকে করহ দান আপোনা জৌবন।।
ইবোল সুনিয়া রাই হরিস হইয়া।
কহিছে রসের কথা শ্যাম মুখ চায়্যা॥
অহে শ্যাম চূড়ামণি দান নিবে তুমি।
নাগরে বলিছে রাই কি বলিব আমি॥
একবার চান্দমুখের আজ্ঞা জদি পাই।
তবে সে ভরসা হয় দান নিতে চাই।।
এসব সুনিয়া বোলে শ্যাম গুণমণি।
বংশী বোলে আজ্ঞা দেও রাধা বিনোদিনি।।
হাসি রসবতি বোলে সোন শ্যাম নাগরে।
মনের বাঞ্ছিত ধন মাগহ আমারে॥
ইহা সুনি শ্যামচান্দ হরিশ অন্তরে।
দুই কর যুড়ি রহে রাধার গোচরে॥
গলায় বসন দিয়া বোলে শ্যামধন।
আমারে করহ দান তোমার জৌবন।।
হাসি রসবতি বোলে সোন সব কথা।
আমার জৌবন দান করিব সর্ব্বথা।।
আমি দান দিব তুমি করিবা গ্রহণ।
ব্রাহ্মণের বেস ধর নন্দের নন্দন॥
ইকথা সুনিয়া শ্যাম হাসিতে লাগিল।
বংশী দাসে বোলে কৃষ্ণ ব্রাহ্মণ হইল॥
ব্রাহ্মণের বেস ধরি নন্দের নন্দন।
রাধার জৌবন দান করিলা গ্রহণ॥
পুরহিত ললিতা বিসখা অদিষ্টতা।
মন্ত্রপাঠ করে দান ব্রজভানু সুতা।।
জৌবন করিলা দান কৃষ্ণের পিরিতে।
এহি মন্ত্র পঠে রাই হাসিতে২॥
তিল তুলসি দিয়া হরিস অন্তরে।
ভাগ্যবতী রাধিকা জৌবন দান করে॥

শ্যামের দক্ষিণ করে তিল জল দিয়া।
আপোনার দেহ দিলা কৃষ্ণে সমর্পিয়া॥
হাসি রসবতি বোলে মধুর বচন।
দানের দক্ষিণা দেও সর্ব্ব মুনিগণ।।
সর্ব্ব দোস ক্ষেমা করি করিবা পালন।
বংশীদাসে কহে মোর এহি নিবেদন।।

ইতি রাই রাজা গ্রহন্ত সমাপ্ত। সহস্কর শ্রী রামমোহন মিত্র। সাকিম দেওভোগ। ইতি সন ১২২১ সন॥

পাঠ ও পাঠান্তর

পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রচণ্ডতায় বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ঘটেছে। চৈতন্যদেবের প্রভাবে বাংলায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রেমধর্মের প্রসার ঘটলেও, সর্বভারতীয় পর্যায়ে এ ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামী উত্তরভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী মতবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন[১]। ষড়গোস্বামী চৈতন্যদেবের আদেশে বৃন্দাবনে গিয়ে লুপ্ত তীর্থ পুনরুদ্ধার এবং বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি বৈষ্ণব দর্শন ও রসশাস্ত্র রচনা করেন[২]। তাঁরা চৈতন্যদেবের পরিবর্তে কৃষ্ণকেই একমাত্র উপাস্য ঘোষণা করেন। জীবাত্মা-পরমাত্মার প্রেমের রূপকে ভগবান পুরুষ কৃষ্ণই পরমাত্মা এবং জীবাত্মার প্রতীক রাধা, কৃষ্ণের অধস্তন ভক্ত। গোস্বামীসিদ্ধান্ত[৩] অনুযায়ী শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এ পাঁচ প্রকারের রসের আশ্রয়ে বৈষ্ণবের সাধনা চললেও পদাবলি রচনার ক্ষেত্রে মধুর রসেরই একচ্ছত্র আধিপত্য দেখা যায়। সেক্ষেত্রে বৃন্দাবনে সংঘটিত রাধাকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলা ছিল পদকর্তাদের অবলম্বন। প্রায় ষোলশত গোপিনীর উপর কৃষ্ণের একচ্ছত্র প্রভাব মধ্যযুগের পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থারই প্রতীক হয়ে উঠেছে। তাই সেই পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতাকাঠামোতে রাখাল রাজা হলেও কৃষ্ণই রাজা এবং সকল গোপিনী তার চরণের দাসী অর্থাৎ অধস্তনশ্রেণি।

এ ক্ষমতাকাঠামোর এক পুনর্বিন্যস্ত চিত্র দেখা যায় *রাইরাজা* আখ্যানে। এ আখ্যানের বীজ নিহিত রয়েছে রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার একটি অংশ ঘাটদানলীলায়। এ লীলাকে ভিত্তি করে রূপ গোস্বামী *দানকেলিকৌমুদী* নামক সংস্কৃত একাঙ্ক নাটক রচনা করেছিলেন। রূপ গোস্বামী বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীর অন্যতম ছিলেন। তাঁর জন্ম আনুমানিক ১৪১১ শকাব্দে অর্থাৎ ১৪৮৯ খ্রিস্টাব্দে এবং আনুমানিক ১৪৮০ শকাব্দে বা ১৫৫৮ খ্রিস্টাব্দে বৃন্দাবনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। রূপ গোস্বামীর অসংখ্য রচনার মধ্যে *দানকেলিকৌমুদী* গুরুত্বপূর্ণ একটি রচনা। এ গ্রন্থের পরিচয় দিতে গিয়ে সুকুমার সেন বলেন:

এটি একটি একোক্তি নাটক (“ভাণিকা”), নাম ‘দানকেলীকৌমুদী’, বিষয় কৃষ্ণের

> ঘাটদান লীলা। এ বিষয় কোন পুরাণে নাই। তবে বাঙ্গালা দেশে গাথায় ও গানে প্রচলিত ছিল। রাধাকুণ্ডতীরবাসী প্রিয় সুহৃদ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর চিত্তবিনোদনের জন্য রূপ *দানকেলীকৌমুদী* রচনা করিয়া ছিলেন নন্দীকেশ্বরে থাকিয়া ১৪৭১ শকাব্দে (১৫৪৯ অব্দে)। (সুকুমার ১, ১৯৭৮: ২৩৯)

রূপ গোস্বামী কৌতুকের ছলে হলেও মধ্যযুগে পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতাতন্ত্রের প্রেক্ষাপটে ক্ষমতা সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসের উদ্ভাসন দেখান যা নিঃসন্দেহে অভিনব। যদিও এ নাটকের ঘটনাপ্রবাহ বৃন্দাবনের রাজা হিসেবে রাধার অভিষেকদৃশ্যের বর্ণনাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। সেখানে কৃষ্ণ এবং তার সখাগণ কর্তৃক কর আদায়ের জন্য অত্যাচারের এক পর্যায়ে রাধা এবং তার সখীরা বৃন্দাবনে তাদের অধিকারের কথা ঘোষণা করে। কেননা দেবীগণ 'স্বর্ণসিংহাসনোপরি শ্রীরাধাকে উপবেশন করাইয়া দিব্য মহৌষধি রসামৃতে মণিকুম্ভ সকল পূর্ণ করিয়া তদ্দারা মহাভিষেক করত বৃন্দাবন-রাজ্যের আধিপত্য অর্পণ করিয়াছিলেন।' (রূপ, ১৯৯৮: ৯৩)

গোপিনীদের এই ঘোষণা শোনার পর কৃষ্ণসখাদের অবিশ্বাস দেখে রাধা ও তার সহচরীবৃন্দ বলেছে,

> শ্রীরাধা। সখী বৃন্দে, আমার অভিষেকের পর কাননের কর আট বৎসর হইল কি না, গণনা কর।
>
> বৃন্দা। (হাস্যের সহিত) বৃন্দাবনেশ্বরী! এই সকল গোপ প্রত্যেক শতকোটি সংখ্যা প্রমাণে গোচারণ করিয়া থাকে, গোপগণের অসংখ্যত্বপ্রযুক্ত গণনা হইতে পারে না, অতএব কাননকররূপ মূল্য দ্বারা তোমা কর্তৃক কৃষ্ণাদি গোপ ক্রীত হইয়া রহিয়াছে। (রূপ, ১৯৯৮ ৯৮)

পরবর্তী ঘটনাদৃশ্যে প্রতীয়মান হয় রাজসিংহাসনে রাধার অভিষেক হয়েছিল কিন্তু সে ক্ষমতাকাঠামোয় নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেনি বা করতে পারেনি। এতে বোঝা যায়, ক্ষমতা এমন কোনো আধার নয় যেখানে কাউকে বসিয়ে দেওয়া যায় এবং ক্ষমতা গ্রহণ করলেই সর্বত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। বৃন্দাবনে রাধার অধিকারের কথা বর্ণনা করে রাধার সখীরা পুনরায় ক্ষমতাচর্চায় উদ্যোগী হয়:

> বিশাখা। এই সকল গর্ব্বিত গোপ লতাপুঞ্জভঞ্জনদক্ষ লক্ষকোটি গো রক্ষা করিতে করিতে ফল দ্বারা উদরভরণ এবং পুষ্পপল্লব দ্বারা পরস্পর বেশ রচনা করত বহুকাল যাবৎ বৃন্দাবনের বিধ্বংসন করিতেছে, অতএব নিশ্চয় করিয়া বল, ইহারা এখান হইতে গমন করুক, নতুবা কর প্রদান করুক। (রূপ, ১৯৯৮: ৮৮)

এখানে উৎপাদনব্যবস্থা এবং তৎসংশ্লিষ্ট করপ্রাপ্তির ইচ্ছা ক্ষমতা অর্জনের প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে কিন্তু সংস্কৃতি ও মতাদর্শগত 'হেজিমনি' বা কর্তৃত্ব তৈরি করতে না পারায় রাধা শেষপর্যন্ত নিজেকেই শুল্করূপে কৃষ্ণের কাছে দান করে।

বৈষ্ণব পদাবলির অন্যান্য লীলার মতোই পরবর্তীকালে এ আখ্যান পল্লবিত হয়ে ওঠে এবং বিভিন্ন পাঠান্তর তৈরি হয়। রাধামাধব ঘোষের *বৃহৎ কৃষ্ণলীলা সারাবলী* গ্রন্থে *রাইরাজা* আখ্যানের আরেকটি পাঠের পরিচয় পাওয়া যায়, সেখানে দেখা যায় কৃষ্ণ গোষ্ঠে গোচারণ করতে গেলে রাধা এবং তার সখীরা বালকের ছদ্মবেশে বৃন্দাবনের উপর তাদের অধিকার ঘোষণা করে:

শ্রীমতী বলেন, শুন নন্দের কুমার।
চিরদিন নিধুবন মোর অধিকার॥
এই বনে যত তৃণ আমার রক্ষণ।
এই বনে তুমি আর না আন গোধন॥
(রাধামাধব, ২০১৯: ৩৪০)

বংশীদাসের *রাইরাজা* আখ্যানে আবার ভিন্ন আরেকটি পাঠ পরিবেশিত হয়েছে। এ পাঠে দেখা যায়, কৃষ্ণের কোলে ঘুমন্ত, অচেতন রাধার হার কৃষ্ণ চুরি করে নেয়; তখন চুরি হওয়া হার উদ্ধারের জন্য রাধা স্বয়ং রাজদণ্ড হাতে তুলে নেয়। রাধার বৃন্দাবনরাজ্যে তার সখীরাই অমাত্যের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল এবং কৃষ্ণ নিযুক্ত হয়েছিল কোতোয়ালের পদে। কৃষ্ণ রাধার পক্ষে নগর থেকে কর উত্তোলন শুরু করে। কিন্তু রাধার চুরি হওয়া হার উদ্ধার করতে যখন কৃষ্ণকে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়, তখন কৃষ্ণ গড়িমসি শুরু করে। হার চুরির সময় সে কোতোয়ালের দায়িত্বে ছিল না বলে দায় এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। যখন রাধার সখীরা কৃষ্ণের দেহ তল্লাশ করে তখন কৃষ্ণের গলাতেই সে হার খুঁজে পাওয়া যায়। চুরি ধরা পরলেও অপরাধী কৃষ্ণের মনে কোনো ভয় বা অনুতাপের প্রকাশ দেখা যায় না। বরং সে তার অপমানের জন্য রাধার ক্ষমতাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে। কৃষ্ণের এই অসহযোগিতার কারণেই রাধার প্রশাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করতে শেষ পর্যন্ত রাধা নিজের জীবন-যৌবন কৃষ্ণের কাছে সমর্পণ করে। আমরা এই প্রবন্ধে বংশীদাসের ভণিতায় প্রাপ্ত *রাইরাজা* পাণ্ডুলিপির পাঠ-বিশ্লেষণের আলোকে মধ্যযুগের সমাজে পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতা সম্পর্কের বিন্যাস ও ক্ষমতার কারিগরি কেমন ছিল, সেই ক্ষমতাতন্ত্রে নারীর অবস্থান কেমন ছিল এবং অধস্তন হিসেবে নারী ক্ষমতা দখল করলেই তার অধস্তনতা দূর হয় কিনা এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে প্রয়াসী হব।

ক্ষমতা ও ক্ষমতার কারিগরি

সাধারণত ক্ষমতা ব্যাপারটিকে শাসন, প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব, নিয়ন্ত্রণ, আধিপত্য এবং প্রভাব বিস্তারের সমার্থক হিসেবে দেখা হয়। তাই দীর্ঘদিন ধরে রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত করে ক্ষমতার আলোচনা করা হয়েছে এবং রাষ্ট্রের সংজ্ঞার্থ নিরূপণ করতে গিয়ে অধিকাংশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই ক্ষমতার প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন। রাষ্ট্রব্যবস্থার কর্তৃত্ব ও দমনমূলক শক্তির প্রতি লক্ষ রেখে David Easton Zuvi *A System of Political Life* গ্রন্থে বলেছেন, "রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সেই সকল পারস্পরিক

প্রতিক্রিয়ারূপে বর্ণনা করা যায়, যার মাধ্যমে কোন সমাজে মূল্য কর্তৃত্বসম্পন্নভাবে বণ্টিত হয়।" (নির্মলকান্তি, ১৯৯৫: ১২৬)। গাব্রিয়েল অ্যালমন্ডও রাজনৈতিক ব্যবস্থার কেন্দ্রে দেখেছেন ক্ষমতাকে। তাঁর মতে:

> রাজনৈতিক ব্যবস্থা হল এমন একটি প্রতিক্রিয়ার ব্যবস্থা যার উপস্থিতি সকল স্বাধীন সমাজেই লক্ষ্য করা যায় এবং যেখানে বৈধ দৈহিক বলপ্রয়োগ বা বলপ্রয়োগের ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে সংহতি ও সঙ্গতিরক্ষার কার্য সম্পন্ন করা হয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থা হল সমাজে বৈধ, শৃঙ্খলা রক্ষাকারী এবং রূপান্তর-সাধনকারী ব্যবস্থা। (নির্মলকান্তি, ১৯৯৫: ১১২)

অর্থাৎ রাষ্ট্রধারণার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব বা দমনের প্রসঙ্গ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, সরকার নামক যন্ত্রের সাহায্যে রাষ্ট্র তার এই কর্তৃত্বপূর্ণ ক্ষমতার চর্চা করে থাকে। এক্ষেত্রে বেশিরভাগ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই রাষ্ট্রকে দেখেছেন দমনমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে। সমাজতাত্ত্বিক কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) পৃথিবীর ইতিহাসকে অভিহিত করেছেন শ্রেণিদ্বন্দ্বের ইতিহাস হিসেবে। বুর্জোয়া শ্রেণি প্রলেতারিয়েত শ্রেণিকে শাসন করে, এ দুই শ্রেণির অবিরাম দ্বন্দ্বে সভ্যতা অগ্রসরমান। মার্কসের মতে, ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে বুর্জোয়া শ্রেণির হাতে এবং এ ক্ষমতা তথা শক্তির আধার হচ্ছে রাষ্ট্র, যা দমনমূলক শক্তির সাহায্যে চালিত। আবার জার্মান সমাজতত্ত্ববিদ ম্যাক্সওয়েবারও (১৮৬৪-১৯২০) মনে করেন, বল বা শক্তিই হচ্ছে রাষ্ট্রের মূলভিত্তি এবং যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন এ শক্তি বা ক্ষমতা তাদের হাতেই থাকবে। উল্লিখিত সবাই ক্ষমতার কেন্দ্র হিসেবে রাষ্ট্রকে চিহ্নিত করেন। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, ক্ষমতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত বিষয় হলো শক্তি। এরই ধারাবাহিকতায় বার্ট্রান্ড রাসেল (১৮৭২- ১৯৭০) ক্ষমতার সংজ্ঞার্থ দিতে গিয়ে বলেন, "কোনও কাজের মাধ্যমে ফলাফল লাভ করাটাই হচ্ছে ক্ষমতা। ক্ষমতা একটি পরিমাণগত ধারণার ব্যাপার।" (রাসেল, ২০২০: ৩৪) তাহলে বলা যেতে পারে, রাষ্ট্র শাসনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তিই ক্ষমতা। তবে শুধু রাষ্ট্রের ওপর নয়, ক্ষমতার প্রভাব পড়তে পারে ব্যক্তির শরীর অথবা মন অথবা দুয়ের ওপরেই। এছাড়া ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষমতার ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কখনও সামাজিক সম্পর্কের ধারণা, আচরণগত ধারণা বা পরিস্থিতিগত ধারণা হিসেবে ক্ষমতার ব্যাখ্যা প্রচলিত হয়েছে।

এক্ষেত্রে নীৎসে (১৮৪৪-১৯০০) ক্ষমতাকে রাষ্ট্রের গণ্ডি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন, ক্ষমতা লাভের ইচ্ছাকে তিনি দেখেছেন বেঁচে থাকার মূলনীতি হিসেবে। নীৎসের পর্যবেক্ষণ:

> প্রত্যেকটি বস্তু হয়ে উঠতে চায়, তার অনেক অনেক সম্ভাবনাকে বাস্তবায়ন করতে চায়। শূন্য থেকে পূর্ণ হয়ে উঠতে ও নিজেকে অতিক্রম করতে বস্তু সব সময়ই সক্রিয়। আর এসব কিছুর পেছনে কাজ করছে একটি শক্তি। (আরিফুল, ২০১৭ : ৭১)

নীৎসে এ শক্তিরই নাম দেন ক্ষমতার ইচ্ছা। ক্ষমতার ইচ্ছা সম্পর্কে তিনি আরও বলেন:

> [My theory would be] -- that the will to power is the primitive form of affect, that all other affects are only develoments of its. (F.W. Nietzsche, 1968: 366)

নীৎসে মনে করতেন, ক্ষমতার ইচ্ছা থেকে সমাজে সংঘটিত হয় পরিবর্তন, এর মধ্য দিয়ে নীৎসে মূলত বিশেষ নৈতিকতার ধারণা প্রস্তাব করেন। তবে নীৎসের ক্ষমতার ধারণা ক্ষেত্রবিশেষে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।

অন্যদিকে আন্তোনিও গ্রামসি (১৮৯১-১৯৩৭) মার্কসের চিন্তাধারাকে সম্প্রসারিত করে, ক্ষমতার সঙ্গে বল প্রয়োগের পাশাপাশি — আধিপত্যের ধারণা যুক্ত করেন। তাঁর মতে, "আধিপত্য হলো একটি কাঠামোগত নিয়ম যা সম্মতি এবং দমন উভয়েরই দ্যোতক।" (মানস, ২০১১: ২১৫) তাই কেউ যদি রাষ্ট্রব্যবস্থায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা না করতে পারে, তবে তার পতন ঘটে। গ্রামসি পর্যন্ত চিন্তাবিদদের আলোচনায় ক্ষমতার একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্র দেখা যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে ফরাসি তাত্ত্বিক মিশেল ফুকো (১৯২৬- ১৯৮৪) ক্ষমতার ধারণায় আরও বৈচিত্র্য আবিষ্কার করেন। তিনি ক্ষমতাকে রাষ্ট্রকাঠামোর গণ্ডি থেকে মুক্ত করে, ক্ষমতা কী? কেন? সেসব প্রশ্ন দূরে রেখে ক্ষমতার চর্চা কীভাবে হয়? – এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজেন এবং ক্ষমতাকে তিনি দেখেন সম্পর্কের নিরিখে, তিনি বললেন:

> ক্ষমতার অনুশীলন মানে হিংসা নয়; এটা এমন কোন সম্মতিও নয় যা নিশ্চিতভাবে পুনর্ব্যবহারযোগ্য। এটা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার একটি সম্পূর্ণ কাঠামো যা বিভিন্ন ক্রিয়ার উপর প্রয়োগ করার জন্য তৈরি হয়। এ উদ্দীপ্ত করে, প্ররোচিত করে, প্রলুব্ধ করে, সহজতর বা আরও কঠিন করে তোলে। (ফুকো, ২০১৬: ২৫৯)

তিনি দেখেন, ক্ষমতার আসলে কোনো নির্দিষ্ট কেন্দ্র বা আধার নেই, ক্ষমতা সর্বব্যাপী। এছাড়া তিনিই প্রথম নেতিবাচকতা থেকে সরে গিয়ে ক্ষমতার ইতিবাচক দিক তুলে ধরেন। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার শরীর ব্যবচ্ছেদ করে তিনি দেখান, আধুনিক রাষ্ট্র তার ক্ষমতার কারিগরি পাল্টে নিয়েছে, এখন রাষ্ট্র শরীর নয় বরং নাগরিকের মনের উপর তার ক্ষমতা চর্চা করে। এক্ষেত্রে ক্ষমতা হয়ে ওঠে জ্ঞানের সমার্থক যা উৎপাদন করে নতুন বাস্তবতার, নির্মাণ করে সত্যের।

ক্ষমতাকাঠামোর পুনর্বিন্যাস

সমাজ কাঠামোর সর্বত্র ক্ষমতা-সম্পর্ক বিরাজমান এবং এ সম্পর্কের টানাপড়েন ঘটাও অস্বাভাবিক নয়। এক্ষেত্রে সম্পর্ক বা আচরণের জন্য প্রয়োজন পড়ে অপর পক্ষের, অর্থাৎ ক্ষমতা-সম্পর্কে সবসময় দুটি পক্ষ থাকে। ক্ষমতা যেহেতু প্রভাবকারী কর্তৃত্ব, তাই তা

তখনই স্পষ্ট হয় যখন তা অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে। অতএব সম্পর্ক ছাড়া ক্ষমতা কল্পনা করা অসম্ভব। ক্ষমতার সম্পর্কের এ সূত্র ধরে বলা যায়, সম্পর্ক সবসময়েই গতিশীল; যেকোনো সময় সম্পর্কের স্থানবদল ঘটতে পারে। ক্ষমতাবান যেমন ক্ষমতাধীনদের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তেমনি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ক্ষমতাধীনও ক্ষমতাবানের উপর প্রভাব বিস্তার করে নিজে ক্ষমতাবান হয়ে উঠতে পারে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ অথবা ক্ষমতাবানের ক্ষমতা সীমিতকরণ অথবা ক্ষমতাবানকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করার মাধ্যমে ক্ষমতা-সম্পর্কের স্থানবদল ঘটতে পারে।

গ্রামসি তাঁর *কারাগারের নোটবই*তে প্রভুশ্রেণির সঙ্গে অধস্তন শ্রেণির দ্বন্দ্বের কথা স্বীকার করেও জানালেন, রাষ্ট্র নাগরিক সমাজের সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শে রূপান্তর ঘটানোর মাধ্যমে ক্ষমতা প্রয়োগ করে। এভাবে কেবল শাসনতন্ত্রে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা নয়, এক সার্বিক সামাজিক কর্তৃত্ব সৃষ্টি করা হয়। অতএব আধিপত্য এবং দমনমূলক শক্তির সমন্বয়ে আধুনিক রাষ্ট্রযন্ত্র গঠিত। গ্রামসি ক্ষমতার এ রূপের নাম দেন আধিপত্য বা 'হেজিমনি'। অর্থাৎ "ব্যক্তির আচরণ পরিবর্তনের অথবা নির্দিষ্ট খাতে ব্যক্তির আচরণকে প্রবাহিত করার বিষয়টিই হেজিমনি।" (ফাহিমুল, ২০১১ : ২৬৮) তিনি মনে করেন, বুর্জোয়া শ্রেণি ক্ষমতা প্রয়োগ করে 'হেজিমনি'র মাধ্যমে। ক্ষমতাসম্পর্কের স্থানবদল প্রসঙ্গে তিনি সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করেন:

> একটি কেন্দ্রীয় অভ্যুত্থানের ফলে শ্রমিকশ্রেণীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হবে, এই ধারণার পরিবর্তে গ্রামশি বলেছেন এক দীর্ঘমেয়াদী কৌশলের কথা, যেখানে রাষ্ট্রযন্ত্রের শীর্ষস্তরে নয় বরং নাগরিক সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভেতরে শ্রমিকশ্রেণী তার বিকল্প সামাজিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। (পার্থ, ২০০৭: ১৭৩)

তাই যতক্ষণ পর্যন্ত অধস্তন শ্রেণি সমাজে প্রভুশ্রেণির বিকল্প 'হেজিমনি' প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করলেও তা স্থায়ী হবে না। গ্রামসি মনে করেন:

> আদর্শগত ক্ষেত্রে বুর্জোয়া সংস্কৃতির আধিপত্য ছাড়া শুধু বলপ্রয়োগের মাধ্যমে বুর্জোয়াশ্রেণী ক্ষমতায় দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। বুর্জোয়া ভাবাদর্শের এই আধিপত্য সিভিল সমাজের পরতে-পরতে হাজার বছরের ব্যক্তিমালিকানাভিত্তিক সংস্কৃতি চর্চা ও অভ্যাসের দ্বারা 'সিমেন্টেড' (cemented) হয়ে আছে। (আকাশ, ২০০৭: ১৯৫)

তাহলে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে হলে অধস্তন শ্রেণিকে শোষকশ্রেণির বিরুদ্ধে মুখোমুখি সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার পাশাপাশি নাগরিক সংস্কৃতিতে বুর্জোয়া ভাবাদর্শের বিকল্প ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠার ক্রমবিবর্তনশীল সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে, এমনটাই গ্রামসি বিশ্বাস করেন। গ্রামসি ক্ষমতার বৈচিত্র্যপূর্ণ রূপ দেখালেও সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রব্যবস্থার বাইরে ক্ষমতার কারিগরি স্পষ্ট করেননি। তাঁর ক্ষমতা সংক্রান্ত ভাবনা তাই রাষ্ট্র বা দলীয় পরিসরের মধ্যেই আবদ্ধ দেখা যায়।

মিশেল ফুকো জানালেন, শাসনের প্রয়োজনে আধুনিক রাষ্ট্র জোর-জবরদস্তির পরিবর্তে ক্ষমতাচর্চার পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে। ফুকো বলেন:

> আধুনিক যুগে ক্ষমতার উৎস রাজা নয়। ক্ষমতার উৎস হচ্ছে রাষ্ট্র, আইন-আদালত ইত্যাদি, যার আনুষ্ঠানিক ভিত্তি হচ্ছে নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অভিমত। ...শাস্তির লক্ষ্যবস্তু অপরাধীর শরীর নয়। শাস্তির উদ্দেশ্যও ভীতি সৃষ্টি নয়। বরং শাস্তির লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে অপরাধীর "আত্মা" এবং উদ্দেশ্য হচ্ছে "অপরাধীর চরিত্র সংশোধন"। (আকাশ, ২০০৭: ১৯৭)

তিনি আলোচনা করলেন ক্ষমতার বিভিন্ন সম্পর্ক প্রসঙ্গে, দেখালেন ক্ষমতার কারিগরি। ক্ষমতা কীভাবে প্রযুক্ত হয় সেই প্রক্রিয়ার অনুসন্ধানে তিনি ব্যাপৃত হলেন। তিনি দেখলেন, আধুনিককালে ক্ষমতা প্রযুক্ত হয় আচরণ নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে। এক্ষেত্রে অনুশীলন না হওয়া পর্যন্ত ক্ষমতা ঠিক ক্ষমতা হয়ে ওঠে না। তিনি ক্ষমতার তিনটি মাত্রার কথা বলেন- সার্বভৌমত্ব, অনুশাসন আর প্রশাসনিকতা। মধ্যযুগের ক্ষমতা বলতে ফুকো সার্বভৌমত্বকেই বোঝান, যেখানে ক্ষমতার এক বা একাধিক কেন্দ্র থাকলেও সার্বভৌমত্বের প্রতিভূ হন কোনো রাজা, যিনি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের উপর নির্দিষ্ট প্রজামণ্ডলীর ওপর তার ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। সার্বভৌম শাসক আইন প্রণয়ন করেন, সে আইনের প্রয়োগ করেন এবং আইন লঙ্ঘনকারীকে শাস্তির আওতায় আনেন। আধুনিককালে এ পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে, তাই ফুকো বলেন, "আধুনিক ক্ষমতাতন্ত্র আদৌ সার্বভৌমত্বের ছক অবলম্বন করে চলে না। তা চলে অনুশাসন বা ডিসিপ্লিনের ছকে।" (পার্থ, ২০০৭: ১৭৪)

আধুনিক যুগে আইনের সাহায্যে মানুষের ওপর প্রতিহিংসামূলক আচরণ বা ভয়ানক শাস্তি প্রদান নয় বরং সামাজিক অনুশাসনে শিক্ষিত করে মানুষের চেতনার পরিবর্তন করাই ক্ষমতাতন্ত্রের উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে নাগরিক শাস্তির ভয়ে নয়, নিজের মঙ্গল হবে ভেবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুশাসনকে মেনে নেয়। অর্থাৎ আধুনিক ক্ষমতাতন্ত্র নাগরিকের সম্মতির ভিত্তিতে শাসন করে। তৃতীয় মাত্রা হলো প্রশাসনিকতা, জবরদস্তি নয় বরং বিশেষ গোষ্ঠীর বিশেষ কল্যাণ সাধনের উছিলায় অথবা বিশেষ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের সম্মতি আদায় করে নেওয়ার কৌশলই হচ্ছে এ প্রশাসনিকতা।

ফুকো দেখালেন, প্রাত্যহিক জীবনের নানা অনুষঙ্গে মানুষ অধীন প্রজায় পরিণত হয়, রাজশক্তির স্বতঃস্ফূর্ত বশ্যতা স্বীকার করে নেয় এবং মানুষ নিজেকে সাবজেক্টিভিটিতে সীমিত করে নেয়। অর্থাৎ ক্ষমতা প্রযুক্ত হয় ব্যক্তির মনের ওপর, ব্যক্তিকে শেখানো হয় আচরণ কেমন হওয়া উচিত, আর কেমন হওয়া উচিত নয়। জ্ঞান থেকে এই ক্ষমতা উৎপাদিত হয় আবার এ ক্ষমতাই জ্ঞানকে পুনরুৎপাদন করে। ফুকো এর নাম দেন ডিসকোর্স। ডিসকোর্স তৈরির প্রক্রিয়ায়, কোনো আদেশ বা প্রতিবন্ধকতার পরিবর্তে ক্ষমতার সম্পর্ক এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় যে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সবকিছু মেনে

নেয়। অর্থাৎ নীতি-নৈতিকতা, মূল্যবোধ এবং কোন বিষয়ে কীভাবে কথা বলতে হবে তার ধরণ নির্ধারণ করে দেয় ডিসকোর্স। বলা যায় ডিসকোর্স ভাষা এবং চিন্তার পদ্ধতি ঠিক করে দেয়। প্রতিষ্ঠিত কোনো ডিসকোর্সে অবস্থান করে ওই ডিসকোর্সের বাইরে চিন্তা- ভাবনা করা যায় না, ফলে ডিসকোর্সের প্রতি পক্ষপাত দেখা যায়। আবার ডিসকোর্সনির্ভর ক্ষমতাসম্পর্কের কেন্দ্রস্থলে থাকে ইচ্ছার প্রতি বিরূপতা এবং স্বাধীনতার প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব, যা এই সম্পর্ককে ক্রমাগত প্ররোচিত করে।

ডিসকোর্সকে প্রতিহত করতে হলে ক্ষমতাসম্পর্কের মধ্যে থেকেই আরেকটি বিকল্প ডিসকোর্স তৈরি করতে হয়। সাধারণত সমাজের কাছে স্বল্প প্রচলিত কিন্তু গ্রহণযোগ্য বিভিন্ন বিশ্বাস-মূল্যবোধ ধীরে ধীরে বিবর্তিত করা হয় এবং একসময় তা সমাজে প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। নবপ্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ অনুযায়ী, সমাজ উচিত-অনুচিতের মানদণ্ড নির্ধারণ করে দেয়। তাই সমাজের পরিবর্তন ঘটাতে হলে শুধু উপরের স্তরের পরিবর্তন করলেই হয় না, যেহেতু ক্ষমতা সম্পর্কের শিকড় সামাজিক বন্ধনের গভীরে বিস্তৃত থাকে, তাই সমাজের মূল্যবোধের পরিবর্তনও অনিবার্য হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে ফুকোর মন্তব্য:

> ক্ষমতার অনুশীলন কোন অনাবৃত সত্য নয়, কোন প্রাতিষ্ঠানিক অধিকার নয়, এমন কোন কাঠামোও নয় যা দাঁড়িয়ে আছে অথবা যাকে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে; এটা বিস্তৃত, রূপান্তরিত এবং সংগঠিত; এটি নিজেকে সেইসব প্রক্রিয়ার দ্বারা সমৃদ্ধ করে যা কমবেশি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে খাপ খায়। (ফুকো, ২০১৬: ২৬১)

অর্থাৎ ক্ষমতা স্থির কোনো বস্তু নয়, নির্দিষ্ট কোনো ছক মেনে ক্ষমতার চর্চা চলে না, প্রয়োজন অনুসারে এর গতি-বিধি বদলে যায়, রূপ-রূপান্তর ঘটে। ডিসকোর্স তৈরির এ প্রক্রিয়া সম্পর্কে ফুকো আরও বলেন, প্রতিনিয়ত চর্চার অভ্যাসের মাধ্যমে কিছু কিছু মূল্যবোধের সাধারণীকরণ করা হয়, সবাই যখন সে মূল্যবোধগুলো মেনে নেয় তখনই ব্যক্তি বিষয়ীতে পরিণত হয়। সে নিজের পরাধীনতা এবং শোষণ সম্পর্কে অসচেতন থাকে। বিদ্রোহ করার ভাবনা তার চিন্তায় কখনও প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

তবে ক্ষমতা-সম্পর্কের মধ্যে প্রভুশ্রেণির আধিপত্যের প্রেক্ষাপটে অধস্তন পক্ষ সবসময়েই সম্পূর্ণ নির্বিরোধী নিশ্চুপ থাকে না, মাঝে মাঝে যেখানে প্রভুত্ব সেখানে পাল্টা প্রতিরোধ এবং বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের ক্ষেত্রে কর্তৃত্ববাদী শ্রেণির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বা বিপ্লব করে রাষ্ট্রক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ জানানো যায়। কিন্তু "রাষ্ট্রক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত কোনও গোষ্ঠী বা পুঁজির মালিক কোনও শ্রেণিকে সরিয়ে দিলেও আধুনিক ক্ষমতাতন্ত্র একই ছকে চলে।" (পার্থ, ২০০৭: ১৭৬) তাই এ প্রক্রিয়ায় সামাজিক পরিবর্তন ঘটানো যায় না, কারণ সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রতিষ্ঠিত ডিসকোর্সের ক্ষমতাচর্চা তখনও অব্যাহত থাকে।

ক্ষমতাসম্পর্কে নারীর অবস্থান

মধ্যযুগের ভারতীয় পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতাকাঠামোর প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা আখ্যানে বৃন্দাবনের রাষ্ট্রক্ষমতা ছিল কৃষ্ণকেন্দ্রিক। তার শুল্ক আদায় সংক্রান্ত অত্যাচারে রাধাসহ অন্যান্য গোপীরা বিদ্রোহ করে ক্ষমতার কেন্দ্র বদলে দেয়। রাধা ক্ষমতার কেন্দ্রে চলে আসে। কিন্তু সমগ্র সমাজ যেখানে পুরুষতান্ত্রিক ভাবাদর্শে সুদৃঢ় সেখানে ক্ষমতার কেন্দ্র পরিবর্তিত হলেও ক্ষমতাতন্ত্রের বিন্যাস অপরিবর্তিত থাকে। কেবল ব্যক্তির পরিবর্তন ঘটে। কৃষ্ণকে সরিয়ে দিয়ে রাধা বৃন্দাবনে যে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেছিল, সে রাষ্ট্রে সার্বভৌম শাসক হিসেবে রাধা আইন প্রণয়ন এবং আইনের প্রয়োগ করেছে; অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য কোতোয়াল হিসেবে কৃষ্ণকে নিযুক্ত করেছে এবং জনগণের কর আদায় করতে সক্ষম হয়েছে। তার এ রাষ্ট্রে সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটলেও শেষ পর্যন্ত তার ক্ষমতাকাঠামো ভেঙে পড়ে। কারণ রাধা সেখানে শুধু সার্বভৌম ক্ষমতার ওপর নির্ভর করেছে, কিন্তু অনুশাসন আর প্রশাসনিকতা প্রয়োগ করে পুরুষতন্ত্রের বিকল্প ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে। সমাজে নারী শাসককে মেনে নেওয়ার মতো ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম না হওয়ায়, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব দখল করলেও রাধা সামাজিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। নারীর শাসন মেনে নেওয়ার মতো মানসিকতা গড়ে না ওঠায় পুরুষতন্ত্র ক্ষমতার চালকের আসনে নারীকে মেনে নেয় না। আবার পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে নারীর ‘হেজিমনি’ প্রতিষ্ঠার জন্য নারী বিকল্প ডিসকোর্স তৈরিতেও ব্যর্থ হয়। ফলে পুরুষতান্ত্রিক কৃষ্ণের সার্বিক অসহযোগিতায় রাধার প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতাকাঠামো ভেঙে পড়ে।

রাইরাজা কাব্যে যে ক্ষমতাকাঠামোর পরিচয় পাওয়া যায়, তা মধ্যযুগের পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার চিত্র হলেও সভ্যতার ইতিহাসে সবসময়ই যে অনুরূপ অবস্থা ছিল তা বলার উপায় নেই। আবার এ অবস্থা একদিনেই হঠাৎ করে তৈরি হয়েছে এমনও নয়। নারীর সামাজিক অবনমনের সমান্তরালতা উপলব্ধি করা যেতে পারে ধর্ম ও দর্শনে দেবীশক্তির অবনমনের মাধ্যমে। এছাড়া সভ্যতার প্রারম্ভে সমাজ মাতৃতান্ত্রিক ছিল, এমনটাই অধিকাংশ সমাজবিজ্ঞানীর অভিমত; যেহেতু সন্তানের পরিচয় নির্ধারিত হতো মায়ের মাধ্যমে। মর্গানের ভাষায়, “প্রাচীনকালে গোত্র গঠিত হত একজন কল্পিত আদি নারীর সন্তানসন্ততি আর তার মেয়েদের সন্তান এবং বংশপরম্পরায় তার মেয়েদের সন্তানদের নিয়ে।” (মর্গ্যান, ১৯৯৭: ৬৯) এ সময় নারী উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গেও যুক্ত ছিল। আর এভাবে যতদিন নারী উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিল ততদিন সমাজে তার অবস্থানও দৃঢ় ছিল। তথাকথিত বর্বর আরণ্যক যুগেও নারী ছিল স্বাধীন এবং সম্মানিত; সমাজের আধিপত্যও ছিল নারীর হাতে। শশিভূষণ দাশগুপ্ত জানান:

> আর্যেতর জাতিগণের মধ্যে পিতৃপরিচয় ছিল গৌণ, মাতৃপরিচয়েই সন্তানের পরিচয়। সমাজ-জীবনের এই মাতৃতান্ত্রিকতাই ধর্মজীবনেরও নিয়ামক হইয়া উঠিয়াছিল; এই ভাবেই তাহাদের ধর্মে মাতৃপ্রাধান্যের প্রতিষ্ঠা এবং হয়তো এই মাতৃপ্রধান ধর্মকে অবলম্বন করিয়াই শক্তিবাদের উদ্ভব এবং ক্রমপ্রসার। (শশিভূষণ, ১৩৯৬ : ৬)

হয়তো সমাজের এই ধারণা থেকেই উদ্ভূত ভয় অথবা বিশ্বাসজাত ধর্মবোধে যখন দৈব কল্পনার অবকাশ তৈরি হয়, তখন আদিশক্তির কল্পনাই মানুষের ভাবনায় আসে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এ আদিশক্তির বিভিন্ন প্রকাশ লক্ষ করা যায়। বৈদিক কাল থেকে ভারতীয় শক্তিকল্পনাতেও এই আদিশক্তি প্রবলভাবে অস্তিত্ববান। বৈদিক এ শক্তির নাম 'শ্রী', পরবর্তীকালে যিনি বিষ্ণুর পত্নী হিসেবে পরিগণিত হন। তবে বৈদিক দেবী 'শ্রী' বিষ্ণুর শক্তিরূপে পরিচিত হলেও শস্য, সৌন্দর্য, সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসেবে তাঁর স্বতন্ত্র পরিচিতি ছিল। কিন্তু কালের প্রবাহে "তিনি বিষ্ণু দেবতার সহিত ধীরে ধীরে অবিনাবদ্ধভাবে বদ্ধ হইয়া গেলেন।" (শশিভূষণ, ১৩৯৬ : ২২)

সভ্যতার বিকাশের এক পর্যায়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণার প্রসার ঘটে এবং "যেমন সম্পদ বাড়তে থাকল তাতে একদিকে পরিবারের মধ্যে স্ত্রীলোকের চেয়ে পুরুষের প্রতিষ্ঠা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে থাকল।" (এঙ্গেলস, ২০১৫ : ৪৩) ফলে সম্পদের মালিক এবং সমাজের নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে পুরুষ। এছাড়া নারী উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় সমাজে মাতৃঅধিকারের উচ্ছেদ ঘটে, প্রতিষ্ঠিত হয় পিতৃতন্ত্র। আর এ প্রক্রিয়ায় নারীকে ঐতিহাসিকভাবে অধস্তন করা হয়েছে। নারী যাতে নিজেকে নিকৃষ্ট-দুর্বল-অযোগ্য ভাবতে বাধ্য হয়, তার সব ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদিও "নারীর কোনো সহজাত অযোগ্যতা নেই, তার সমস্ত অযোগ্যতাই পরিস্থিতিগত, যা পুরুষের সৃষ্টি বা সুপরিকল্পিত এক রাজনীতির ষড়যন্ত্র।" (আজাদ, ১৯৯২ : ২৫)

লৈঙ্গিক রাজনীতির শিকারে পরিণত নারী, পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে দৃশ্যত দুটি কারণে, জৈবিক পেশীহীনতা এবং অর্থনৈতিক অধস্তনতা। নারীকে বোঝানো হয়েছে যে, নারী জীবনধারণের জন্য পুরুষের ওপর নির্ভরশীল। কৌশলগত পরিস্থিতি সৃষ্টি করে নারীকে অসহায় দেখানোর মাধ্যমে পুরুষতন্ত্র নারীর ওপর আধিপত্য কায়েম করেছে। এক্ষেত্রে পুরুষতন্ত্রের সার্বিক পরিকল্পনার যে প্রক্রিয়া কেট মিলেট (১৯৩৪- ২০১৭) দেখিয়েছেন, সেখানে আছে ভাবাদর্শগত, জৈবিক, সমাজতাত্ত্বিক, শ্রেণি, আর্থ ও শিক্ষাগত, বলপ্রয়োগ, নৃতাত্ত্বিক এবং মনস্তাত্ত্বিক কৌশল। পুরুষতন্ত্র এ কৌশলগুলো প্রয়োগ করে নারীকে সামাজিকীকরণের মাধ্যমে পুরুষের আধিপত্য মেনে নিতে সম্মত করায় এবং তাকে পুরুষের রুচি-পছন্দ অনুযায়ী তৈরি করে। নারীর ভাবনায় "পুরুষই শ্রেষ্ঠ, এমন একটি কুসংস্কার বদ্ধমূল করে তোলে পুরুষতন্ত্র, তাই অবস্থানগতভাবে পুরুষ পায় উচ্চ মর্যাদা, নারী পায় নিম্ন মর্যাদা। (আজাদ, ১৯৯২ : ২৭) এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, নারীকে অধস্তন শ্রেণি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জবরদস্তিমূলক পথ পরিহার করে পুরুষতন্ত্র নিজেদের পক্ষে নারীর সম্মতি আদায় করেছে; যদিও "পিতৃতন্ত্র বলপ্রয়োগের অধিকার অর্পণ করেছে পুরুষের ওপর। সমাজের উচ্চশ্রেণীর পুরুষেরা তা শারীরিকভাবে প্রয়োগ না করলেও মনস্তাত্ত্বিকভাবে প্রয়োগ করে ভালোভাবেই।" (আজাদ, ১৯৯২: ৩৬)

সমাজকাঠামোর এই ক্ষমতার সম্পর্ক ধর্ম এবং দর্শনকেও প্রভাবিত করেছে, তাই বৈদিক 'লক্ষ্মী' বা 'শ্রী' শক্তিরূপিণী অবস্থান থেকে সরে এসে পরম প্রেমরূপিণী মূর্তিতে পরিণত হয়। আধিপত্যের স্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে "বৈষ্ণব শাস্ত্রের ভিতর আসিয়াই লক্ষ্মী তাহার সকল স্বাতন্ত্র্য বিষ্ণুর ভিতরে লুপ্ত করিয়া কেবলমাত্র বিষ্ণুশক্তি বা বিষ্ণু-প্রিয়া সত্তা লাভ করিয়াছেন।" (শশিভূষণ, ১৩৯৬ : ২২) দেবীশক্তি যখন স্বতন্ত্র শক্তি থেকে শক্তিমানের শক্তি তথা সামর্থ্যে পরিণত হয়েছে, তখন থেকেই নারীর অধস্তনতা পূর্ণতা পেয়েছে। এ পর্যায়ে শক্তি স্বাধীন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকল না বরং তা সাপেক্ষ হয়ে পড়ল, অর্থাৎ "শক্তিব্যতীত শক্তিমান কখনও কারণরূপে অবস্থান করে না, আবার শক্তিমান ব্যতীত একা শক্তি কখনও অবস্থান করে না।" (উদ্ধৃত, শশিভূষণ, ১৩৯৬ : ২৯) দৈবী কল্পনা হলেও এর মধ্য দিয়ে নারীর অবনমনের ইতিহাসই বিধৃত হয়েছে। অবশ্য এভাবে নারীকে আধিপত্য থেকে অধস্তনতায় পর্যবসিত করা হলেও সম্পূর্ণরূপে নারী অস্তিত্বহীনও হয়ে যায় না, পুরুষতন্ত্র নারীর জন্য এ সীমিত সম্মানটুকু বরাদ্দ রাখে। তাই পরবর্তীকালের দেবকল্পনায় অবিসংবাদিতভাবে পুরুষ দেবতার প্রাধান্য থাকলেও সকল দেবতাকেই শক্তিসমন্বিত অবস্থায় দেখা যায়। বিষ্ণুর শক্তি লক্ষ্মী, রামের শক্তি সীতা, কৃষ্ণের শক্তি রাধা, শিবের শক্তি পার্বতী। নারী ছাড়া পুরুষ এখানে অপূর্ণ, তন্ত্রেও এর পরিচয় পাওয়া যায় কেননা,

> তন্ত্রের মূল সিদ্ধান্ত – অর্থাৎ শিব এবং শক্তি কেহই আপনাতে আপনি পূর্ণ নন, তাহারা উভয়েই একটি পরম অদ্বয় সত্যের দুইটি খণ্ড অংশ মাত্র, যুগলেই তাঁহাদের পূর্ণ একরূপ, -ইহা যেন ভারতীয় গণমনেরই একটি মূল সিদ্ধান্ত। এই জন্যই শক্তির সহিত যুক্ত না হইলে কোনো দেবতাই যেন পূর্ণ নহেন। (শশিভূষণ, ১৩৯৬: ৪)

বৈষ্ণব শাস্ত্রেও স্বাধীন শক্তি যখন বিষ্ণুর সঙ্গে লীন হয়ে যায় তখন সে স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলে। ভারতীয় সংস্কার অনুযায়ী দেবী বা নারী সম্মানের আসনে আসীন হলেও তার সম্মান এতটুকুই যে, "তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া, তাই স্বেচ্ছায়ই তিনি বিষ্ণু প্রীত্যর্থে সব গৃহকর্ম করিলেও গৃহকর্মের ক্ষেত্রে তিনি যেন স্বতন্ত্রা।" (শশিভূষণ, ১৩৯৬: ২৭) এই প্রক্রিয়ায় রাধা দার্শনিক শক্তিরূপ পরিত্যাগ করে, মধুর রসাশ্রিতা প্রেমময়ী হয়ে উঠেছে। কিন্তু এভাবে ধর্মের সহযোগিতায় নারীকে জন্মগতভাবে অধস্তন দেখানোর প্রয়াস থাকলেও, নারীর অধস্তনতা জন্মগত নয় বলেই এখন বিশ্বাস করা হয়। পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতায় পুরুষ যখন ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে তখন সে তার পেশী গঠনের পাশাপাশি নারীর মনস্তাত্ত্বিক অভ্যাস তৈরির জন্য প্রচারণা চালায় যে, "পুরুষ হবে আক্রমণাত্মক, বুদ্ধিমান, বলশালী, ফলপ্রদ আর নারী হবে নিষ্ক্রিয়, মূর্খ, বশমানা, সতী ও অপদার্থ।" (আজাদ, ১৯৯২ : ২৮) এভাবে পুরুষতন্ত্র পুরুষের একক আধিপত্য ঘোষণা করে তাকে করেছে আধিপত্যবাদী প্রভু আর নারীকে করেছে সেই পুরুষের অধীন দাসী। *তৈত্তিরীয় সংহিতায়* বলা হয়েছে, "সর্বগুণান্বিতা নারীও অধমতম পুরুষের থেকে হীন।" তাই দীর্ঘকাল ধরে পুরুষতান্ত্রিক

চিন্তায় অভ্যস্ত নারী আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করলেও শ্রেণি উত্তরণ ঘটাতে পারে না। নারী তখনও পুরুষের মতোই পুরুষতান্ত্রিক চিন্তায় আবদ্ধ থাকে।

রাইরাজা কাব্যে ক্ষমতাসম্পর্কের বিন্যাস

রাইরাজা কাব্যে দেখা যায়, পুরুষতন্ত্রের প্রতিভূ কৃষ্ণ বৃন্দাবনে স্বেচ্ছাচারী শাসনব্যবস্থা কায়েম রেখেছে এবং শাসক হিসেবে যথারীতি বিভিন্ন কৌশলে প্রজার ওপর আধিপত্য বিস্তারের পাশাপাশি প্রজার আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করেছে। প্রজারাও সেখানে শাসকের সামান্য সাহচর্য এবং আনুকূল্য অর্জন করতে পারলেই কৃতার্থ বোধ করে। রাধাসহ অন্য গোপনারীদের দেখা যায়, নিজেদের অধিকারবোধ এবং স্বাধীনতা সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। এ পরিস্থিতিতে শাসকের প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসে জনগণ যখন আত্মসচেতনতা বিস্মৃত হয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়ে, তখনই শাসকশ্রেণি তার স্বরূপ প্রদর্শন করে। তাই যখন রাধা সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণে সমর্পিত এবং কৃষ্ণের কোলেই নিদ্রিত তখন:

রাধারে মুচ্ছিত দেখী সুনাগর হরি।
রাধার হিয়ার হার নাগরে কৈল চুরি॥

শাসিত রাধা শাসকের এই শোষণ সম্পর্কে সজাগ হয় বটে, কিন্তু ততক্ষণে অনেক বিলম্ব হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণরূপে সর্বহারা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত জনসাধারণের জাগরণ ঘটে না, এখানেও তাই ঘটেছে। অধস্তন শ্রেণির রাজনৈতিক চেতনা প্রখর না হওয়ায়, ক্ষমতাতন্ত্রের জটিল কলা-কৌশল তাদের পক্ষে বোঝা সহজ হয় না। তাই সর্বস্ব হারালেও তারা তাৎক্ষণিকভাবে তা বুঝতে পারে না, কীভাবে হারালো বা কে চুরি করল এসব বিষয়ে সূক্ষ্ম চিন্তার প্রকাশ তাদের মধ্যে দেখা যায় না। শুধু তাই নয়, সম্পদ চুরির বিচার কোথায় কার কাছে জানাবে সে বিষয়েও তারা অনভিজ্ঞ। ফলে হার চুরির পর রাধার অসহায়তাই প্রকাশ পায়

কেবা হরি নিল মোর গজমতি হার।
কেবা রাজা কারে কবো কে করে বিচার॥

সরকার যখন রাষ্ট্রের নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধানে উদাসীন অথবা রাষ্ট্রই যখন নিরাপত্তা হরণকারী তখন নাগরিকের আত্মসচেতনতা জেগে ওঠে, তারা তখন প্রশ্ন তোলে সরকারব্যবস্থা নিয়ে অথবা বিকল্প সরকার প্রতিষ্ঠা করে। বৃন্দাবনের গোপিনীরাও রাষ্ট্রের অনুপস্থিতিতে নতুন শাসনকাঠামো প্রস্তাব করে। রাধাকে রাজা করে তারা নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা করে। পুরুষতান্ত্রিক কৃষ্ণের ক্ষমতাকাঠামোকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বিকল্প সরকার গঠন করে। বংশীদাস বলেন:

নিধুবনে রাজা কর রসবতি রাই॥
তবে সে হইব হার চুরির বিচার।

রাধা বৃন্দাবনের আনুষ্ঠানিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। অভিষেক প্রক্রিয়ার বিধি-বিধান অনুসারে সিংহাসনে রাধার অভিষেক হলে, কৃষ্ণ রাধার বশ্যতা স্বীকার করে নেয় এবং নিজেকে রাধার অধস্তন হিসেবে প্রকাশ করার জন্য আগ্রহাতিশয্য দেখায়। ক্ষমতাকাঠামো এখানে উলটে যায়, প্রভু শ্রেণি অধস্তন শ্রেণিতে পরিণত হয়। কৃষ্ণের শ্রেণি অবস্থান পাল্টানোর সঙ্গে সঙ্গে তার ভূমিকাও বদলে যায়। তাই রাধা রাজপদে অভিষিক্ত হওয়ার পর যে প্রশাসন-কাঠামো গড়ে তোলে এবং নারীরাই সেই প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে অভিষিক্ত হয়। তবে রাধার নেতৃত্বে বিকল্প সরকারব্যবস্থা গড়ে উঠলে কৃষ্ণও ক্ষমতাবলয়ের বাইরে থাকে না, সেও পুনর্বিন্যস্ত ক্ষমতার অংশীদার হয়ে ওঠে। অতি-উৎসাহের সঙ্গে এ বিকল্প সরকারের গুরুদায়িত্বে অধিষ্ঠিত হয় কৃষ্ণ। নাগরিকের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব সে নিজের কাঁধে তুলে নেয়। রাধা, কৃষ্ণের কাকুতি-মিনতির ফলে তাকে কোতোয়ালের পদে নিযুক্ত করতে সম্মত হয়। এ থেকে ব্যাখ্যা করা যায়, রাধা নতুন কাঠামো গড়ে তুললেও সেখানে কৃষ্ণকে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়; কারণ, রাধা বা তার সখীরা আকস্মিকভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করলেও, ক্ষমতার অনুশীলন সম্পর্কে তাদের অনভিজ্ঞতা সুস্পষ্ট। আবার কৃষ্ণের উদ্দীপনা এবং দাপটের প্রভাব স্বীকার করে তাকে কোতোয়ালের পদে বরণ করার নেপথ্যে হয়তো পুরুষতন্ত্রের শেখানো নারীর পেশিহীনতার প্রচারণার কথা রাধার মনে জেগে থাকতে পারে। তাই তার যোগ্য সহচরী থাকা সত্ত্বেও সে কোতোয়ালের পদে কৃষ্ণকেই বেছে নেয়। নির্দেশ পাওয়া মাত্রই কৃষ্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং রাধার প্রতিনিধি হিসেবে কর আদায়ের জন্য সে বৃন্দাবনবাসীদের ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। তার দায়িত্ব পালন ব্রজবাসীদের উপর অত্যাচার হিসেবেই প্রতিভাত হয়। এছাড়া রাধার শাসনকে নেতিবাচক হিসেবে প্রচারণার মাধ্যমে কৃষ্ণ মূলত রাধার ক্ষমতার পরোক্ষ বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়।

এদিকে কৃষ্ণ যখন ছদ্মনিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছে, তখনই রাধার হার চুরির প্রসঙ্গ আসে। এ সময়েই রাধার ক্ষমতার স্বরূপ স্পষ্ট হয়। সবাই কোতোয়াল কৃষ্ণকে রাধার হার উদ্ধার এবং হার চোরকে সনাক্ত করার জন্য তৎপর হতে বলে। এবার কৃষ্ণ পরোক্ষ বিরোধিতা থেকে সরে এসে প্রত্যক্ষ বিরোধিতা শুরু করে। হার চুরির প্রসঙ্গ শোনামাত্র কৃষ্ণ তার দায়িত্ব থেকে পিছিয়ে আসে। যদিও রাধার প্রতি আনুগত্যের ছদ্মবেশ সে ত্যাগ করে না। তথাপি তার স্পষ্ট ঘোষণা যে, তার কোতোয়ালির সময় যেহেতু হার চুরি হয়নি, তাই সে- হার উদ্ধার বা চোরকে শনাক্ত করার দায়িত্ব তার নয়। রাধার আদেশের বিরোধিতার মধ্য দিয়ে বোঝা যায়, ক্ষমতার সম্পর্ক ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হচ্ছে। এতে সকল সংশয় দূরীভূত হয় যে, রাষ্ট্রের শাসক হিসেবে রাধা অধিষ্ঠিত হলেও ক্ষমতাচর্চায় কৃষ্ণের প্রভাব অব্যাহত রয়েছে।

রাধা যখন তৎপর হয়ে কোতোয়াল কৃষ্ণকেই তল্লাশ করার জন্য পাত্র-মিত্রদের নির্দেশ দেয়, তখন কৃষ্ণই চোর সাব্যস্ত হয়। গ্রেফতারের পর অপমানিত-লাঞ্ছিত কৃষ্ণ

রাধাকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে দুর্বল করার প্রয়াস পায় এবং নিজের সম্মানহানির প্রসঙ্গ তুলে রাধার শাসনব্যবস্থার প্রতি কটাক্ষ করে। কৌশলে সে রাধার শাসনামলের চেয়ে তার শাসনামলের সক্ষমতা এবং উৎকর্ষ প্রমাণ করতে উদ্যোগী হয়। এছাড়া হার চুরির বিচারের পরিবর্তে সে নিজেই এখন তার মাথার চূড়া, কুণ্ডল এবং পীতবসন চুরির বিচার দিচ্ছে। অর্থাৎ পরিবর্তিত ক্ষমতাকাঠামোয় বিচারের মুখোমুখি হওয়ায় সে এখন নিজেকে পীড়িতের ভূমিকায় প্রতিস্থাপিত করছে। রাধাকেন্দ্রিক ক্ষমতাকাঠামো ভেঙে দেওয়ার জন্য এটা কৃষ্ণের সচেতন কৌশল। এর মধ্য দিয়ে কৃষ্ণ নিজের ক্ষমতাকে বৈধতাদানের প্রয়াস পায় এবং রাধার ক্ষমতাকে উল্টো চ্যালেঞ্জ জানায়। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক ভাবাদর্শে অভ্যস্ত রাধা কৃষ্ণের এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণের সম্মুখে রাধার অসহায়তা প্রকাশ করতেই হয়, একজন নারী হিসেবে পুরুষের অধস্তনতাই তার ভবিতব্য হয়ে ওঠে। কৃষ্ণের সব অপরাধ মার্জনাই শুধু নয়, কৃষ্ণের সঙ্গ পাওয়ার জন্য রাধাকে কিছু দান করার সংকল্পও করতে হয়। রাধা ভেবে পায় না কৃষ্ণকে কী দান সে দেবে, সখীদের কাছে এ বিষয়ে পরামর্শ চাইলে সখীরা রাধার যৌবন দান করার পরামর্শ দেয়। এবার দান গ্রহণের জন্য অনুরুদ্ধ হয়ে কৃষ্ণ আনন্দিত চিত্তে রাধার যৌবন দান হিসেবে প্রার্থনা করে, রাধাও কৃষ্ণের আকাঙ্ক্ষা পূর্তির উদ্যোগ নেয়। সমাজকাঠামো অনুযায়ী কৃষ্ণের কাছে রাধার এমন আত্মসমর্পণ ভিন্ন অন্য কোনো উপায় মধ্যযুগে ছিল না।

মধ্যযুগের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে দীর্ঘদিনের চর্চা ও অভ্যাসের মাধ্যমে নারীর মনস্তত্ত্বে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা এমনভাবে বদ্ধমূল করে দেওয়া হয়েছে যে, নারীরও যে চিন্তার স্বাতন্ত্র্য এবং স্বকীয়তা থাকতে পারে, সে সম্পর্কে তারা অসচেতন। বংশীদাস এ ক্ষমতাকাঠামোর একটি পুনর্বিন্যস্ত চিত্র উপস্থাপন করেছেন, যেখানে রাধা পুরুষতন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বিকল্প শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছে, যা মধ্যযুগের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অভিনব পরিকল্পনা। যদিও শাসক হিসেবে শাসনতন্ত্রে প্রভুত্ব স্থাপন করেও রাধা সামাজিক কর্তৃত্বে সর্বেসর্বা হয়ে উঠতে পারে না; কারণ, তার শাসন মেনে নেওয়ার মনোভাব সে কৃষ্ণের মনে জাগাতে পারেনি। রাধার চিন্তা পুরুষের চিন্তা হিসেবেই প্রতীয়মান হয়েছে, তাই সে রাষ্ট্রক্ষমতার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ও ভাবাদর্শিক জগতে প্রভাব বিস্তার করার মাধ্যমে সমাজের মূল্যবোধ পরিবর্তন করে নতুন মূল্যবোধ গ্রহণ করার মানসিকতা তৈরি করতে পারেনি। ফলে শাসিতের সম্মতিতে শাসনের নৈতিক ভিত্তিও সুদৃঢ় হয়নি এবং শেষ পর্যন্ত সকল তৎপরতা প্রেমতত্ত্বে পর্যবসিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে নারীকে অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য পুরুষতন্ত্রের প্রতিস্পর্ধী বা প্রতিযোগী কোনো ভাবাদর্শ বা মূল্যবোধ উৎসারিত বিকল্প ডিসকোর্স প্রস্তাব করতে না পারলে পুনর্বিন্যস্ত ক্ষমতাকাঠামোর ব্যর্থতা অনিবার্য। তাই শেষ পর্যন্ত পুরুষতন্ত্রই জয়ী হয়; সাময়িক আলোড়ন সৃষ্টি করলেও নারীর প্রতিবাদ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়; নারীর অধস্তনতা দূর হয় না বরং নারীকে প্রেমময়ীর মাহাত্ম্যেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

টীকা

১. "গোস্বামীসিদ্ধান্ত মতে শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর, তিনিই অনন্য উপাস্য। চৈতন্যদেব ও শ্রীকৃষ্ণ এক নন। গোস্বামীগ্রন্থে চৈতন্যদেবের অবতারত্বও স্বীকৃত হয় নাই। গোস্বামীগ্রন্থের বিচারে চৈতন্যদেব ভক্তশ্রেষ্ঠ, তিনি প্রেমভক্তি লাভের উপায়।" (হিতেশ, ১৯৮৯: ৯)

২. "সর্বভারতীয় দর্শন প্রচারে যোগ দিয়া নূতন মত প্রচারের চেষ্টা চৈতন্যদেবই প্রথম করিলেন। চৈতন্যদেব নিজে ভক্তিসিদ্ধান্ত কিছু লিখিয়া যান নাই। তাঁহার অনুগামী সনাতন গোস্বামী, রূপ গোস্বামী, গোপাল ভট্ট গোস্বামী ও জীব গোস্বামী বৃন্দাবনে বসিয়া চৈতন্যপন্থার ভক্তিশাস্ত্র রচনা করেন।... চৈতন্যদেব তাহাদের বৃন্দাবনে থাকিয়া লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও ভক্তিশাস্ত্র প্রণয়নের দায়িত্ব দিয়াছিলেন।" (হিতেশ, ১৯৮৯: ৫-৬)

৩. চৈতন্যপন্থীদের তত্ত্ব ও শাস্ত্রালোচনার ফল গোস্বামীসিদ্ধান্ত। (হিতেশ, ১৯৮৯: ১৭১)

সহায়ক পঞ্জি

এম. এম. আকাশ, ২০০৭। 'ক্ষমতাপ্রশ্ন ও মিশেল ফুকোর মতামত', *মিশেল ফুকো পাঠ ও বিবেচনা,* পারভেজ হোসেন সম্পাদিত, সংবেদ, ঢাকা।

নির্মলকান্তি ঘোষ, ১৯৯৫। *আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা,* শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, কলিকাতা।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ২০০৭। 'ক্ষমতা প্রসঙ্গে দুই প্রেক্ষিত: গ্রামশি ও মিশেল ফুকো', *মিশেল ফুকো পাঠ ও বিবেচনা,* পারভেজ হোসেন সম্পাদিত, সংবেদ, ঢাকা।

ফাহিমুল কাদির, ২০১১। 'গ্রামসীয় পরিপ্রেক্ষিতে সিভিল সোসাইটি', *আন্তোনিও গ্রামসি জীবনসংগ্রাম ও তত্ত্ব,* খন্দকার সাখাওয়াত হোসেন সম্পাদিত, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

ফ্রেডরিক এঙ্গেলস, ২০১৫। *পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি,* হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা।

বংশীদাস, ১২২১। *রাইরাজা* পাণ্ডুলিপি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ: ৯৫০ ।

বার্ট্রান্ড রাসেল, ২০২০। *ক্ষমতা,* শেখ মাসুদ কামাল ও কাজী রেহানা মাসুদ অনূদিত, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা।

মানস রায়, ২০১১। 'আধিপত্য ধারণার পুনর্নির্মাণ প্রসঙ্গে', *আন্তোনিও গ্রামসি জীবনসংগ্রাম ও তত্ত্ব,* খন্দকার সাখাওয়াত আলী সম্পাদিত, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

মিশেল ফুকো, ২০১৬। 'বিষয়ী ও ক্ষমতা', *মিশেল ফুকো,* ভাষান্তর: অনুরাধা দে, সংকলক চীরঞ্জীব শূর, আলোচনাচক্র, কলকাতা।

মোঃ আরিফুল ইসলাম ও মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, ২০১৭. নীৎসের ক্ষমতার দর্শন, *Coppula*: *Jahangirnagar University Studies in Philosophy*, Vol. XXXIV.

রূপ গোস্বামী, ১৯৯৮। *দানকেলিকৌমুদী,* মহেশ লাইব্রেরী প্রকাশন সংস্থা, কলকাতা।

রাধামাধব ঘোষ, ২০১৯। *বৃহৎ কৃষ্ণলীলা সারাবলী,* অক্ষয় লাইব্রেরি, কলকাতা।

লুইস হেনরী মর্গ্যান, ১৯৯৭। *এনসিয়েন্ট সোসাইটি*, অসীমকুমার চট্টোপাধ্যায় অনূদিত, দীপায়ন, কলিকাতা।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ১৩৯৬। *শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ,* এ মুখার্জী এ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

সতীশচন্দ্র রায়, ১৩৩৮ । *পদকল্পতরু,* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা।

সুকুমার সেন, ১৯৭৮। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

সৈয়দা ফরিদা পারভীন, শাহীন সুলতানা ও সৈয়দ আলী আকবর, ২০০৬। *পাণ্ডুলিপি পরিচিতি,* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ঢাকা।

হিতেশরঞ্জন সান্যাল, ১৯৮৯। *বাঙ্গলা কীর্তনের ইতিহাস,* কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা।

হুমায়ুন আজাদ, ১৯৯২। *নারী,* আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

F. W. Nietzsche, 1968. *The will to power*, Trans. By Walter Kaufmann and R. J. Hollingdale, Edited by Walter Kaufmann, Vintage Books, New York.